বাঙালির ডিকিনসন-চর্চা : একটি দীপ নির্জনতার

ঋতম্ মুখোপাধ্যায়

একটি মোম নিভৃতে পোড়ে
সে কি দাহ কেউ জানে না;
একটি দীপ নির্জনতার!
(এমিলি ডিকিনসন : এক নির্জন দ্বীপ, তরুণ মুখোপাধ্যায়)

A real translation is transparent; it does not cover the original, does not black its light, but allows the pure language, as though reinforced by its own medium to shine upon the original all the more fully.
(The Task of the Translator, Walter Benjamin, 1923 / Venuti, 2004 : 21)

ভাষাকে ভাব প্রকাশক চিহ্নের বিন্যাসতন্ত্র হিসেবে দেখেছিলেন সোস্যুর। সাহিত্যের প্রকাশও ঘটে ভাষার মাধ্যমেই। আর ভাষান্তর এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় সেই সাহিত্যকে পৌঁছে দিতে পারে। কিন্তু ভাষান্তরে বদলে যায় শব্দ, অন্বয় রচনাশৈলী এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চিহ্নগুলি। যে-কারণে রবীন্দ্রনাথ কবিতার অনুবাদকে ভিন্ন দেশ ও ভাষার পরিসরে পুনর্জন্ম হিসেবেই দেখতে পছন্দ করতেন। একালের অনুবাদতত্ত্বের সীমানা অনুবাদ নিছক আক্ষরিক, ভাবানুবাদ বা রূপান্তরে সীমায়িত নয়, বরং অনুবাদ বলতে এখন ভাষান্তর ছাড়াও সমভাষিক ও চিহ্ন ও মাধ্যমের বদল ঘটিয়ে অনুবাদের কথাও আমাদের জানিয়েছেন রোমান ইয়াকবসন। তবে সর্বদাই মূল ভাষা থেকে অনুবাদ বেশি প্রামাণ্য হিসেবে স্বীকৃত হয়। যদিও এটা ভুললে চলে না, ভাষাজ্ঞান থাকলেই ভালো অনুবাদক হওয়া যায় না। ইংরেজি অনুবাদ থেকে টেক্সট অনেকক্ষেত্রে-ই যে মানোত্তীর্ণ হয়েছে, তেমন উদাহরণও তো কম নেই। পুষ্পময়ী বসুর অনুবাদে *মাদার* (রুশ), অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের তরজমা *আন্তিগোনে* (গ্রিক) কিংবা শঙ্খ ঘোষের *ইকবাল থেকে* (ফারসি) — প্রতিটিই মূল ভাষা থেকে অনূদিত না-হয়েও অসামান্য। ফরাসি, জার্মান বা রুশ ভাষায় তেমন সড়গড় নন বলে বোদল্যের-রিলকে-হ্যেল্ডার্লীন-পাস্তেরনাক অনুবাদক বুদ্ধদেব বসুকে একালে নিন্দিত হতে হলেও তাঁর অনুবাদের হাত ধরেই এইসব সাহিত্যিকদের সঙ্গে বাঙালির নিবিড় পরিচয় ঘটেছে। অতএব মূল ভাষা জানা থাকলে খুবই ভালো, না-থাকলে সংশ্লিষ্ট ভাষা জানেন এমন কারও সহযোগিতায় ভালো অনুবাদকে স্বীকৃতি দিতে আমাদের দ্বিধান্বিত হওয়া সঙ্গত নয়। তবে ইংরেজি ভাষা থেকে বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রে এই সংকট নেই। আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত কাজের ভাষা ইংরেজি দেশভেদে যদিও ভিন্নতা পায়, তবু মৌলিক নীতি খুব আলাদা নয়। উনিশ শতকে ইংরেজ উপনিবেশের কারণে ইংরেজি সাহিত্যের যেসব অনুবাদ আমরা পেয়েছি, সেখানে ব্রিটিশ সাহিত্যই প্রধান।

ইংল্যাণ্ড-স্কটল্যাণ্ড এবং আয়ারল্যাণ্ডের ইংরেজি সাহিত্য-ই সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু বিশ শতকে এসে আমরা দেখতে পেলাম আমেরিকার ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি বাঙালির অনুরাগ। রবীন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্রনাথ-প্রেমেন্দ্র মিত্র-বিষ্ণু দে-র হাতে অনূদিত হলেন কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান (১৮১৯-১৯৯২)। আলাদাভাবে *হুইটম্যানের শ্রেষ্ঠ কবিতা* (১৯৫৮) প্রকাশ করলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। পরবর্তীকালে দুই বাংলায় একাধিক অনুবাদ হয়েছে হুইটম্যানের কিন্তু বিচ্ছিন্ন কিছু অনুবাদ ছাড়া সামগ্রিক ভাবে বাঙালির কাছে সেইভাবে পৌঁছননি প্রায় সমকালীন এবং একইরকম গুরুত্বপূর্ণ আমেরিকান কবি এমিলি ডিকিনসন (১৮৩০-১৯৮৬)। জীবৎকালে অল্প সংখ্যক কবিতা প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর, আবিষ্কৃত হন মৃত্যুর পর তাঁর বোন লাভিনিয়া ও বন্ধুদের আগ্রহে। উনিশ শতকের শেষ দুই দশক পার করে বিশ শতকে পাঠকের দরবারে পূর্ণ মহিমায় পৌঁছতে তাঁর লেগেছিল আরও কয়েক দশক। তাঁর কবিতার নির্জনতার আবহ, প্রচ্ছন্ন রোম্যান্টিকতা, মৃত্যুচেতনা, তারবার্তার মতো আপাত নিরাবেগ সুর সমকালের পক্ষে বেশি অগ্রবর্তী ছিল। তাই কিছুটা পরিমার্জিত আকারে প্রকাশিত প্রথম সংকলনটি মোটেই কবির স্বলক্ষণকে ফুটিয়ে তোলেনি। ফলে বঙ্গদেশে ডিকিনসন-অনুবাদ কিংবা তাঁকে নিয়ে প্রবন্ধ বা বই প্রকাশ আরও অনেক পরের ঘটনা হওয়াই স্বাভাবিক।

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে একুশের দ্বিতীয় দশকে ডিকিনসন-চর্চার বলয়ে তিরিশের কবি থেকে সত্তর-আশি-নব্বইয়ের কবিদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আরও একটা জিনিস লক্ষণীয়, অনুবাদক বা আলোচকেরা অধিকাংশই কিন্তু পুরুষ।

সত্তা বেছে নেয় তার নিজস্ব সমাজ

ছাপ্পান্ন বছরের স্বল্পায়ু চিরকুমারী ডিকিনসনের কবিতার ভাষা তারবার্তার মতো সংক্ষিপ্ত, সংহত ও অকারণ আবেগবর্জিত হওয়ায় জনপ্রিয়তা মেলেনি তেমন। যদিও প্রেম, প্রকৃতি, ঈশ্বর আর মৃত্যুকে বিষয় করে আত্মিক রোজনামচার মতো বুদ্ধিদীপ্ত কবিতা লিখে গেছেন তিনি, যা শ্লেষ-বিদ্রূপ-কূটাভাষময়। উপমা-চিত্রকল্পের অভিনবত্বে ও ভাবনার গভীরতায় তিনি মেটাফিজিক্যাল কবিদের উত্তরজাতিকা এবং সম্ভবত আমেরিকার প্রথম নারীচেতনাদীপিত আধুনিক কবি, যিনি লিখতে পারেন '*আত্মা বেছে নেয় তার আপন সঙ্গী / তারপর — রুদ্ধ করে দ্বার —*' কিংবা '*আমার জীবন দাঁড় করানো ছিল — এক গুলিভর্তি বন্দুক —*'-এর মতো স্মরণীয় পঙ্‌ক্তি। ইদানিং আমেরিকাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ডিকিনসন সোসাইটি। তাঁকে নিয়ে হয়ে চলেছে একাধিক আলোচনাসভা, পাঠচক্র, পেন্সিলে লেখা পাণ্ডুলিপির পাঠ ও পাঠান্তর-চর্চা। অথচ পারিবারিক রক্ষণশীলতা এবং নিজের প্রচারবিমুখ মনোভাবের কারণে জীবৎকালে কবি হিসেবে তাঁর তেমনভাবে স্বীকৃতি মেলেনি । মৃত্যুর পর তাঁর হাজার দুয়েকের কাছাকাছি কবিতার সম্ভার এখন বিশ্বকবিতার অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। গবেষকেরা লক্ষ করেছেন, ডিকিনসন তাঁর কবিতায় কিছু শব্দের প্রথম বর্ণকে বড় হাতের রাখেন, প্রচুর ড্যাশ দিতে পছন্দ করেন, ব্যাকরণের নিয়ম ভাঙেন এবং তথাকথিত পেলবতা তাঁর কবিতায় নেই। বরং রয়েছে আপাত আবেগহীনতার অন্তরালে প্রেম, সমকাম, নারীচেতনা, ধর্মভাবনা, প্রকৃতিপ্রীতি এবং যুদ্ধের অভিঘাত তাঁর কবিতায় মেলে। খুব নিখুঁতভাবে বিচার করলে তাঁর কবিতার প্রধান চারটি স্তম্ভ হলো : প্রেম, মৃত্যু, ধর্ম ও প্রকৃতি। বিষয় হিসেবে নতুন কিছু নয়, কিন্তু উচ্চারণগত নিজস্বতা তাঁকে স্বতন্ত্র করেছে। বিশ শতকীয় মার্কিন কবিতা, অপেরা, থিয়েটার ও চলচ্চিত্র ডিকিনিসনের কবিতার কাছে প্রেরণা পেয়েছে অবিরত। তবে বাংলা ভাষায় ডিকিনসন-চর্চার ইতিহাস আমরা রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগেই পেয়েছি মূলত। রবীন্দ্রনাথ হুইটম্যান কিংবা এমি

লোয়েল অনুবাদ করলেও ডিকিনসন পড়েছেন কিনা বা পড়লেও ভালো লেগেছিল কিনা তার কোনো প্রমাণ আমাদের কাছে নেই। তবে রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী ডিকিনসন পড়তেন এমন তথ্য অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের স্মৃতিকথনে জানা যায়। তিনি লিখেছিলেন :

> বিবিদি, অর্থাৎ ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী রবীন্দ্রসংগীতে মৃত্যুভাবনা ও বিশ্বচেতনা কীরকম একাকার হয়ে আছে সেই মর্মে একদিন হৈমন্তিক গানের ক্লাস নিতে গিয়ে তাঁর কয়েকটি কবিতা আমাদের পড়ে শুনিয়েছিলেন। সেদিন তিনি আমাদের ঋজুকণ্ঠে শুনিয়েছিলেন : 'সত্তা বেছে নেয় তার নিজস্ব সমাজ / তারপরে রুদ্ধ করে দ্বার' (The soul selects her own Society – / Then shuts the door)। এর বেশি তিনি কিছুই বলেননি, কিন্তু তখন থেকেই অবচেতন অনুষঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সামীপ্যেই এই মনস্বিনীকে যেন দেখেছি বা দেখতে চেয়েছি। (দু'রকম রোদ্দুর, রবীন্দ্র-আলোকবর্ষে, ২০১২ : ১৬৫)

আর এভাবেই ডিকিনসনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় শুরু। যার অভিঘাতে তিনি প্রথম যৌবনে শঙ্খ ঘোষের সঙ্গে যুগ্মভাবে *সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত* (মাঘ, ১৩৬৯/১৯৬২) সম্পাদনা করতে গিয়ে হুইটম্যানের ঠিক পরেই এমিলি ডিকিনসনের চারটি কবিতার অনুবাদ অন্তর্ভুক্ত করেন : কখনো দেখিনি (অনুবাদক : কবিতা সিংহ), তির্যক রোদ্দুর (অনুবাদক : সুপর্ণা সেন), আত্মা বেছে নেয় তার পথ (অনুবাদক : দেবতোষ বসু), একটি হলুদ তারকা (অনুবাদক : মানস রায়চৌধুরী)। এর বাইরে আমরা পেয়েছি বিষ্ণু দে-কে, *তুমি রবে কি বিদেশিনী* (১৯৮৬) অনুবাদ সংকলনে ডিকিনসনের ন'টি কবিতার অনুবাদ তাঁকে করতে দেখি আমরা। যদিও মূল কবিতার প্রথম লাইন বা কবিতার সংখ্যা উল্লেখ করেননি তিনি। ফলে অনেকক্ষেত্রে মূল কবিতা চিনতে কিছুটা অসুবিধে হয় পাঠকের। বিচ্ছিন্নভাবে নবনীতা দেবসেন ও দেবতোষ বসুর কিছু অনুবাদ আমরা পাই, বাংলাদেশেও বেশ কয়েকজনের হাতে অনুবাদ হয়েছে তাঁর কবিতা। তবে গ্রন্থাকারে কেবল ডিকিনসনকে নিয়ে চর্চার প্রবণতা বাংলা ভাষায় আসতে লেগেছে একটা শতাব্দী। ২০১৮ সালের জানুয়ারিতেই প্রথমবার ডিকিনসনের পঞ্চাশটি কবিতার যথাসাধ্য মূলানুগ অনুবাদ এবং একটি বিস্তৃত পরিচায়িকায় এই স্বভাব স্বতন্ত্র কবি ডিকিনসনকে বাঙালি পাঠক-পাঠিকার কাছে সাদরে পৌঁছে দিলেন আটের দশকের প্রবীণ কবি-অনুবাদক ও প্রাবন্ধিক ড. ঊর্মিলা চক্রবর্তী; উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে একদা ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনার পাশাপাশি যিনি গবেষণা করেছিলেন সিলভিয়া প্ল্যাথ ও ডিকিনসনের কবিতা নিয়েই। *এমিলি ডিকিনসন : অনন্য জীবন, ভিন্ন উচ্চারণ* (২০১৮, এভেনেল প্রেস, ১৫০ টাকা) শীর্ষক ছয় ফর্মার পেপারব্যাকটি বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে প্রথম এমিলি ডিকিনসনকে দুই মলাটের পরিসরে একক ভাবে এনে হাজির করলো এপার বাংলায়। ওপার বাংলা তথা বাংলাদেশেও কিন্তু প্রায় সমসময়ে পেশায় চিকিৎসক কবি-অনুবাদক জিললুর রহমান প্রকাশ করেছেন এমনি আরেকটি অনুবাদ-সংকলন *এমিলি ডিকিনসনের কবিতা* (চৈতন্য প্রকাশনী, সিলেট, ফেব্রুয়ারি ২০১৮)। যদিও এ-গ্রন্থে ভূমিকা ও অনুবাদকের কৈফিয়ৎ ঊর্মিলাদেবীর তুলনায় সংক্ষিপ্ত। এই বইয়ের সূত্রেই জানা যায় বাংলাদেশের সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের কথা, যিনি ১৭৭৫ টির মধ্য থেকে ১০৫ টি কবিতার বঙ্গানুবাদ করেছিলেন (তাঁর 'Wild nights' এর ভাষান্তর 'প্রমত্ত রাত' বেশ ভালো, তবে ঊর্মিলার 'বন্য রাত্রিগুলি' বা জিললুরের 'বুনো রাতগুলো' প্রতিতুলনায় আসতেই পারে। যদিও গোমেজ বঙ্গীকরণে আগ্রহী বলেই ইংরেজি ইডেন-কে অনুবাদে নন্দন করেছেন। তাঁর আরও অনুবাদের সন্ধান আমরা পাইনি)। এছাড়াও পাই মোঃ মনিরুজ্জামান, মলয় রায়চৌধুরী, সাফিউল্লাহ, আব্দুল্লাহ আল মুক্তাদির, মেজবাউল হুসেন শাহ্, কল্যাণী রমা প্রমুখ অনুবাদকের নাম — এঁরা বিচ্ছিন্নভাবে অল্প কিছু অনুবাদ করেছিলেন। এরপর ২০২১

ও ২০২২-এ প্রকাশ পেল আরও দুটি পুস্তিকা যেখানে ডিকিনসন-কেন্দ্রিক বাংলা প্রবন্ধ ও অনুবাদ কবিতা একসঙ্গে স্থান পেয়েছে, বই দুটি হলো সত্তরের কবি ও প্রাবন্ধিক অধ্যাপক তরুণ মুখোপাধ্যায়ের *এমিলি ডিকিনসন : কবি ও কবিতা* (কথাকৃতি, অগাস্ট ২০২১) এবং *এমিলি ডিকিনসন : নির্জন আত্মার কবি* (মৃত্তিকা, জুলাই ২০২২)। প্রথম বইয়ে পঁচিশটি ছোট কবিতা এবং পরেরটিতে তেরোটি অনুবাদ কবিতা সংকলিত হয়েছে। এরপরেও অনূদিত হয়েছেন ডিকিনসন সামাজিক মাধ্যমে, ছোট পত্রিকায় বিচ্ছিন্নভাবে একাধিক কবি-অনুবাদকের কলমে, যে তালিকায় এই প্রবন্ধলেখক রয়েছেন (যথা : A word is dead = একটি শব্দ মৃত, If I can stop one heart = আমি যদি রুখে দিতে পারি একটি হৃদয়ের ভাঙন)। তবু একথা অনস্বীকার্য মার্কিন কবি হুইটম্যান বা রবার্ট ফ্রস্টের অনুবাদ ও চর্চা বাংলায় যেভাবে হয়েছে, সে তুলনায় ডিকিনসন উপেক্ষিতা।

কেউকেটা হয়ে কাটাবার ক্ষত

বাংলা ভাষায় ডিকিনসন-চর্চার দু-টি লক্ষ্য : বঙ্গানুবাদে ডিকিনসন-চর্চার তুলনামূলক অনুবাদতাত্ত্বিক পাঠ এবং সমালোচকের কলমে ডিকিনসন ও বাংলা সাহিত্যের তুলনায়ন প্রসঙ্গ। অনুবাদতাত্ত্বিক সমালোচনার ক্ষেত্রে একই উৎস পাঠের (Source Text) একাধিক লক্ষ্য পাঠ (Target Text) আমাদের ব্যাখ্যার কাজ সহজ করে দেয়। আমরা বুঝে নিতে পারি একই কবিতা কীভাবে একাধিক অনুবাদকের কলমে ভিন্ন মাত্রা পায়। রবীন্দ্রনাথ এক বিদেশি সাংবাদিককে জানিয়েছিলেন : ‘A poem cannot be translated, it can only be re-lived in a different atmosphere’ (মিত্র, ২০১২ : ১১৮) — এই প্রেক্ষণ একেবারেই অসঙ্গত নয়। অনুবাদতত্ত্বের মূল উদ্দেশ্যই হলো মূলানুগত্য ও স্বাধীনতার ভারসাম্য কতটা রক্ষিত হলো অথবা হলো না তাকে নিপুণভাবে বিচার করা। এই বিচার করতে গিয়ে আসে ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, জেন্ডার বা লিঙ্গভেদ, অনুবাদের সঙ্গে ক্ষমতার সম্পর্কে ইত্যাদি নানাবিধ ভাষা-সমাজ-রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ। ফলত অনুবাদ নিছক ভাষান্তর বা রূপান্তর হিসেবে আজকের দিনের দীক্ষিত পাঠকের কাছে গৃহীত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। তাই ডিকিনসনের কবিতা যখন দেবতোষ বসু বা অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত কিংবা সুমন গুণ নিজস্ব শৈলতে পুনর্লিখন করেন, তখন ঊর্মিলা চক্রবর্তী চান ডিকিনসনের স্বাতন্ত্র্যকে প্রায় মূলানুগ তুলে আনতে। তবে কি দেবতোষ বা অলোকরঞ্জন, সুমন — এঁরা অনুবাদক হিসেবে বিশ্বাসঘাতক? অনুবাদতত্ত্ব বলবে এও আরেকরকমের অনুবাদ, বরং বলা ভালো অনুসৃজন কিংবা পুনর্লিখন। আমরা ২৮৮ সংখ্যক কবিতা (I am Nobody! Who are you?)-এর দুটি অনুবাদ যদি পাশাপাশি রেখে পড়ি পুনর্লিখনের প্রভেদ টের পাওয়া যাবে। এছাড়াও পাওয়া যায় এ-কবিতার আরও তিনটি অনুবাদ। এখানে মূল কবিতার পাণ্ডুলিপি-চিত্র সহ অনুবাদগুলি পাশাপাশি হাজির করা হলো :

ডিকিনসনের মূল কবিতা (I’m Nobody! Who are you?)	**ঊর্মিলা চক্রবর্তীর অনুবাদ (কোনো নাম নেই)**	**সুমন গুণের অনুবাদ (ক্ষত)**
I’m Nobody! Who are you? Are you – Nobody – too? Then there’s a pair of us! Don’t tell they’d advertise – you know!	আমি *তুচ্ছ* লোক, তুমি কে? তুমিও কি – *তুচ্ছ* মানুষ? তবে এই তো আমাদের দুজনের জোড়া বোলো না কিন্তু কাউকে! ওরা বিজ্ঞাপন দিয়ে দেবে –	আমি তো তুচ্ছ, তেমন কেউ না তুমিও কি তাই? এসো না তাহলে আমরা গোপনে সখ্য পাতাই!

	জানো তো!	রাষ্ট্র কোরো না, সবাই তাহলে খবর করবে!
How dreary – to be – Somebody! How public – like a Frog – To tell one's name – the livelong June– To an admiring Bog!	কি নিরানন্দ – হওয়া – *কেউকেটা*! কি প্রকাশ্য – *ব্যাঙের* মতো – নিজের নাম চিল্লানো – গোটা *জুনমাস* ধরে – স্তাবক *জলাভূমিকে* ডেকে ডেকে!	কেউকেটা হয়ে কাটাবার ক্ষত খুঁচিয়ে তুলবে! উদোম ব্যাঙের কলরব নিয়ে সারাটা সময় বেঁচে থাকা বড় অশ্লীল আর অপমানময়

এই কবিতায় ডিকিনসনের প্রচারবিমুখ মনের ছবি আছে। উনিশ শতকে আমেরিকার পিউরিটান সমাজের এক সম্ভ্রান্ত মহিলা ডিকিনসন তাঁর সৃষ্টির সৌন্দর্যকে বিজ্ঞাপিত করতে আগ্রহী নন, চিৎকৃত আত্মপ্রচারে তাঁর স্পৃহা নেই। খ্যাতির গরল পান করে তিনি হুজুগের কবি হননি, উত্তরকাল যদিও তাঁকে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা দিয়েছে। যাইহোক, এহেন কবিতার ঊর্মিলাকৃত অনুবাদ কবির বড় হাতের অক্ষর বাঁকা অক্ষরে এনে, ড্যাশ সহ অন্যান্য যতিচিহ্নগুলি সযত্নে রক্ষা করার প্রয়াস করেছে। এ-অনুবাদ ডিকিনসনীয় চারিত্র্য বজায় রেখেই তারবার্তার মতো সংক্ষিপ্ত, সংযত আবেগ; তদুপরি অনেকটা আক্ষরিক হয়েও ঊর্মিলার নিজস্ব শৈলীতেই পুনর্লিখিত। তাই tell one's name = 'নিজের নাম চিল্লানো' কিংবা Nobody = 'তুচ্ছ লোক', 'তুচ্ছ মানুষ' এইসব বঙ্গানুবাদে তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যা ও শব্দ নির্বাচন খুব স্বাভাবিকভাবেই গুরুত্ব পেয়েছে, বাংলা ভাষার অন্বয়কেও মেনে নিতে হয়েছে। শুধু অন্ত্যমিলের মাধুর্য এই অনুবাদে অনুপস্থিত, বাকি সবই ডিকিনসনসুলভ। অর্থাৎ এ কবিতা যে এক বিদেশিনীর তা অনুবাদক পাঠককে ভুলতে দেন না, তাই জুনমাসকে আষাঢ় বা শ্রাবণে রূপান্তরিত করেননি। আর এই সূত্রেই অনুবাদতাত্ত্বিক লরেন্স ভেনুটি নির্দেশিত অনুবাদের দেশিকরণ (Domestication) ও বিদেশিকরণ (foreignization)-এর ধারণাদুটির উল্লেখ জরুরি হয়ে পড়ে। ঊর্মিলা অনেকাংশে বিদেশিকরণে বিশ্বাসী, তাই তাঁর লক্ষ্য বাংলায় ডিকিনসনকে চেনানো, কোনোভাবেই বাংলায় সুখপাঠ্য ডিকিনসনী অনুবাদভাষ্য প্রস্তুত করা নয়। তিনি ডিকিনসনের কবিতার সুখপাঠ্য অনুবাদের নমুনা দেখে আক্ষেপ করেন, যে ডিকিনসন, সুখপাঠ্য লেখা লিখতে রাজি না হয়ে অজ্ঞাত হয়েই জীবন কাটিয়ে গেলেন আর আজ তাঁর সুখপাঠ্য অনুবাদ হচ্ছে! তিনি বিশ্বাস করেন, অনুবাদে কবি যথাযথ ভাবে বেঁচে থাকবেন, অনুবাদকের সেই দায়ভার গ্রহণ করা উচিত। আর কবি-অনুবাদক ঊর্মিলা চক্রবর্তীর এই অভিমত প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে ৪ নভেম্বর ২০১৯ কবি-অধ্যাপক সুমন গুণের ফেসবুকে পোস্ট করা পূর্বোদ্ধৃত অনুবাদটির সূত্রে। যদিও সুমন গুণের ডিকিনসন সুখপাঠ্য, দেশিকরণের উদাহরণ। একে অনুবাদতাত্ত্বিক ভাবানুবাদ অপেক্ষা মুক্ত বা স্বাধীন অনুবাদ বলতেই অনেকে পছন্দ করবেন, ইংরেজিতে যাকে বলা যায় rewording বা free / loose translation। বুদ্ধদেব বসু সম্ভবত একেই অনুলিখন বলতেন, আর পুরুষোত্তম লাল একেই বলতেন অনুসৃজন (transcreation)। এখানে সুমন ডিকিনসনের ভাবটিকে নিয়ে বাংলা ভাষায় একটি কবিতা লিখেছেন, মূলের স্তবক বিন্যাস বা ড্যাশচিহ্নের যে বিপুল ব্যবহার, তাকে বর্জন করেছেন। বিস্ময়চিহ্ন কেবল রেখেছেন, সঙ্গে আছে অন্ত্যমিল। কিন্তু এই অনুবাদ কখনওই ডিকিনসনের ভাষাশৈলী মেনে করা হয়নি। সুখপাঠ্যতা ডিকিনসনের কবিতার শর্তই ছিল না, তাঁর কবিতা আপাতভাবে নীরস, তারবার্তার মতো নিরাবেগপ্রায়। সেখানে 'ক্ষত' মূল কবিতাতে নেই, public = উদোম উপযুক্ত বিকল্প নয়। তবে ডিকিনসন প্রচার নয় নির্জনতা চান, সেই বার্তা এই অনুসৃজনেও পাওয়া যাচ্ছে। তবে অনেকক্ষেত্রেই

সুমন ব্যাখ্যা করেছেন নিজের মতো করে। বিশেষত শেষ লাইনে 'বেঁচে থাকা বড় অশ্লীল আর অপমানময়' শুনতে ভালো লাগলেও মূলে তো নেই, এমনকি বাদ দিয়েছেন 'To tell one's name – the livelong June– / To an admiring Bog!'-এর অনেকাংশ, 'উদোম ব্যাঙের কলরব' পর্যন্ত বোঝা গেল, কিন্তু জুনমাসের নির্দিষ্ট কাল কিভাবে কেবল 'সারাটা সময়' হতে পারে, আর নাম ধরে চেঁচানো তথা আত্মপ্রচারের প্রসঙ্গ শুধু 'কলরব' দিয়ে মোটেই বোঝানো যায় না। স্তাবক, জলাভূমি ইত্যাদিরও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উল্লেখ নেই। ফলত, ডিকিনসন-প্রাণিত এই কবিতা বলা চলে, আর অনুবাদ মূলানুগত নয় একেবারেই। অনেকেই বলবেন, অনুবাদতত্ত্ব অনুসারে অনুবাদের 'unique text' হয়ে ওঠাও তো জরুরি কথা এখন। আর সেকারণেই এই অনুবাদ বর্জনীয় বা উপেক্ষার যোগ্য নয়। এও আরেকভাবে ডিকিনসনকে পড়া, আর অনুবাদকের নিজের পড়াটাই তো অনুবাদে প্রতিফলিত হয়। অতএব লেখক যখন উৎপাদক আর অনুবাদক পুনরুৎপাদক, সেক্ষেত্রে এইসব বিচ্যুতি ও সংযোজন ঘটে যাওয়া স্বাভাবিক। যুক্তিসংগত কিনা সেটা ভিন্ন প্রশ্ন, তার উত্তরও পরিস্থিতি সাপেক্ষে নানারকম।

প্রসঙ্গত জানা উচিত, এই বিশেষ কবিতাটির বিষ্ণু দে, জিললুর রহমান এবং তরুণ মুখোপাধ্যায়-কৃত আরও তিনটি অনুবাদের সন্ধান মেলে, যেগুলিতে দেখা যায় মূল কবিতার একটি পাঠান্তরকে অনেকেই গ্রহণ করেছেন এবং তা হলো 'advertise / banish'। ফলে কোথাও বা বিজ্ঞাপনের বদলে নির্বাসন এসেছে তরজমায়। অনুবাদ তিনটি কালানুক্রমিক ভাবে উদ্ধার করা হলো। এ-কবিতায় ডিকিনসনের প্রচারবিমুখ স্বভাবের সঙ্গে আমাদের সহজেই পরিচয় ঘটে। যে-কবি লিখতে পারেন 'সত্তা খুঁজে নেয় তার নিজস্ব সমাজ / তারপর রুদ্ধ করে দ্বার' তিনি যে এমনই কবিতা লিখবেন, তা বুঝতে অসুবিধে হয় না :

বিষ্ণু দে-র অনুবাদ **(কেউকেটা)**	**জিললুর রহমানের অনুবাদ** **(আমি কেউ নই! তুমি কে?)**	**তরুণ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদ** **(আত্মবিচার)**
আমি তো কিছুই নই। তুমি কি তা শুনি তুমিও কিছুই নও? বেশ, তাহলে আমরা একজোড়, কিন্তু বোলো লোক? না কাকেও, জানলেই নির্বাসনে পাঠাবে বিদেশ। কেউকেটা হওয়া সে কি দুর্বহ ব্যাপার, কি প্রকাশ্য যেন এক ব্যাং গালফোলা, সারাদিন নিজ নাম কীর্তন শোনায়, মুগ্ধ শ্রোতা ডোবা কাদাগোলা।	আমি কেউ নই তুমি কে? তুমিও কি কেউ নও তবে? একজোড়া তবে আমরা দু'জন? কাউকে বলো না! ওরা বলে বেড়াবে, তুমি তো জানোই! কতোটা বিষাদসময় কেউ একজন হওয়া! কতো প্রকাশ্য সে– একটা ব্যাঙের মতো– দীর্ঘায়ুজনের প্রশংসাকারী জলার মধ্যে কেউ একজনের নাম জপ করে যায়।	আমি কেউ নই! কিন্তু তুমি কে, বলো? আমার মতন তুমিও সামান্য তবে আমরা দুজনে সমগোত্রীয় – কাউকে বলো না। তাহলে যে ওরা দেবে নির্বাসন, জানো নিশ্চয়। কেউ কেউ কী নিরানন্দ, বিষণ্ন! কেউ বা চটুল, মুখর যেরকম ব্যাঙ নিজের নাম চেঁচিয়ে বলে আজীবন দিনভর আর জলাভূমি প্রশংসায় মুখর।

এক তির্যক রোদ্দুর

এখন আমরা সকলেই জানি, *সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত* গ্রন্থে একাধিক কবির কবিতা নিজেকেই অনুবাদ করতে হয়েছিল বলে অলোকরঞ্জনের বেছে নেওয়া ছদ্মনাম ছিলো সুপর্ণা সেন। সেই সুপর্ণা সেনের আড়ালে অলোকরঞ্জনের করা 'There is a certain slant of light' কবিতার অনুবাদ ঐ 'তির্যক রোদ্দুর' — নারীর কবিতার পুরুষকৃত অনুবাদ আসলে। এ-অনুবাদের মূলানুগত্য নিয়ে প্রশ্ন তোলবার অবকাশ তিনি রেখেছেন, কারণ 'তির্যক রোদ্দুর' ডিকিনসনের কবিতার অনুসৃজন। এখানে ডিকিনসনের ড্যাশের অবিরল ব্যবহার কিংবা তারবার্তার মতো ভাষারীতি অনুপস্থিত। বরং এক ছন্দিত, শ্রবণসুভগ শব্দবিন্যাসে মৃত্যুভাবনার এ-কবিতা অনেকখানি অনুবাদক অলোকরঞ্জনের পুনঃসৃষ্টি। উত্তরকালে ডিকিনসন-গবেষক ও কবি-অনুবাদক ঊর্মিলা চক্রবর্তী তাঁর অনুবাদকের কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে যে-কথা বলেন, তা অলোকরঞ্জনের এই অনুবাদের সমস্যাকে চিহ্নিত করে :

> অনেকের মতে বাঙালি পাঠকের কাছে গ্রহণীয় করে তোলার জন্য, বিদেশি কবিতাকে বাংলায় শ্রুতিসুখকর করবার জন্য, অনুবাদককে কিছুটা স্বাধীনতা নিতেই হয়। কিন্তু এমিলি ডিকিনসনের কবিতা অনুবাদের সময় এ যুক্তি খাটে না কারণ তিনি পাঠকের কাছে গ্রহণীয় হয়ে ওঠবার জন্য শ্রুতিসুখকর কবিতা কোনওদিন লেখেননি, এবং তাঁর কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবার পক্ষে সেটাই একটা প্রতিবন্ধক ছিল। তাঁর কবিতায় শক্তি আসে অনেক গভীর থেকে, গভীর অনুভূতি ও অনন্য জীবনবোধ থেকে। তাই তাঁর কবিতায় এমন স্বাধীনতা নেওয়া যায় না। (ভূমিকা, *এমিলি ডিকিনসন : অনন্য জীবন, ভিন্ন উচ্চারণ*, ২০১৮ : ১১)

এখানে আমরা ঐ অনূদিত কবিতাটির মূল এবং দুটি অনুবাদ পাশাপাশি রেখে কবিতাটিকে বুঝতে চাইব। দ্বিতীয় অনুবাদটি, বলাই বাহুল্য, ঊর্মিলা চক্রবর্তীর নিজের করা। অথ দৃষ্টান্ত :

উৎস পাঠ	**অলোকরঞ্জনের অনুবাদ**	**ঊর্মিলা চক্রবর্তীর অনুবাদ**
There is a certain Slant of light, Winter Afternoons – That oppresses– like the Heft Of Cathedral Tunes –	শীত এলে এক তির্যক রোদ্দুর বিকেলগুলিতে ঝরে নির্জিত করে, যেন গির্জের সুর হৃদয়কে চেপে ধরে।	আলোর এক বিশেষ *বক্রতা* আছে শীতের *বিকেলগুলিতে*; যা ভারাক্রান্ত করে, *উত্তোলনের* মতো *ক্যাথিড্রালের সুরের* –
Heavenly Hurt, it gives us – We can find no scar, But internal difference – Where the Meanings, are –	সৌর আঘাতে সে অবসন্ন করে; কিন্তু দেখি না যত, পার্থক্যটা আছে অভ্যন্তরে সংকেত গুহাহিত।	স্বর্গীয় *আঘাত*, সে দেয় আমাদের; আমাদের চোখে পড়ে না কোনও ক্ষতচিহ্ন, শুধু ভিতরে পালটে যায়, যেখানে *তাৎপর্যেরা* থাকে –
None may teach it – Any – Tis the seal of Despair – An imperial affliction Sent us of the Air	একে তো শেখাতে পারবে না কোনো জন, যাতনা, অভিজ্ঞান আমাদের দিকে বায়ুপ্রেরিত সে সে সন্তাপ মহীয়ান।	কেউ তা শেখাতে পারেনা – *একটুও*; এ হল হতাশার *সীলমোহর*; এক রাজকীয় অসুখ যা *হাওয়া* পাঠায় আমাদের কাছে;

When it comes, the Landscape listens – Shadows – hold their breath – When it goes, 'tis like Distance On the look of Death – (There is a certain slant of light)	সে যখন আসে, দৃশ্য নীরবে শোনে, ছায়া রুদ্ধশ্বাস, যখন সে যায়, মৃত্যুর চোখে যেন দৃষ্টি দূর, উদাস। (তির্যক রোদ্দুর)	সে যখন আসে, *নিসর্গ* কান পাতে; ছায়ারা – রুদ্ধ করে শ্বাস – যখন সে যায়, যেন *দূরত্বের* মতো *মৃত্যুর* মুখচ্ছবিতে – (২৫৮ সংখ্যাক কবিতা)

মন দিয়ে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, অলোকরঞ্জনের কাব্যশৈলীতে যে তৎসম শব্দপ্রীতি এবং ছন্দের দোলা তা এই অনুবাদে রয়েছে। এই অনূদিত রূপটি অনুসৃজন এবং কবিতা হিসেবে চমৎকার। মূল কবিতার ড্যাশ এবং যতিচিহ্নের ডিকিনসনীয় শৈলী অনুবাদে একেবারেই নেই, অন্ত্যমিল বজায় রেখেছেন যদিও। 'heft' অনুবাদে বাদ পড়েছে, সম্ভবত প্রতিশব্দের অভাবে (যদিও ঊর্মিলা 'উত্তোলন' ব্যবহার করেছেন)। এই 'heft' শব্দটি ভারসূচক, যা ঐ শ্রাব্য বাক্প্রতিমাকে স্পর্শজ করেছে। অর্থাৎ ঐ শীতের বিকেলের আলো শরীরে ও মনে অবসন্নতা আনে। এছাড়া দ্বিতীয় স্তবকে 'হেভেন্‌লি হার্ট'-এর পর কমা তো নেই-ই, সেই সঙ্গে সৌর আঘাত এবং অবসন্নতার ছবিটিও মূল থেকে দূরে সরে গেছে। এছাড়াও পরবর্তী স্তবকগুলিতে 'যাতনা, অভিজ্ঞান', 'সন্তাপ মহীয়ান' ইত্যাদি তাঁর অনুসৃজন। আর শেষে মৃত্যুর দৃষ্টিকে দূর, উদাস দেখিয়ে দাঁড়ি দিয়েছেন। মূলে ড্যাশ দিয়ে উন্মুক্ত সমাপ্তি রেখেছেন ডিকিনসন, অনুবাদে তা নেই। 'উদাস' শব্দটিও অনুবাদকের সংযোজন। ফলত কবিতাটির শেষে তির্যক রোদ্দুরের সঙ্গে প্রতিতুলনায় ব্যবহৃত মৃত্যুর চোখে দেখা দূরত্বের ছবিটি ঈষৎ বদলে গিয়ে হয়ে দাঁড়ায় মানুষের যন্ত্রণার প্রতি মৃত্যুর উদাসীনতা (মনে রাখতে হবে এটি আসলে মেটাফিজিকাল কনসীট বা বেশ বিসদৃশ তুলনা)। আসলে এক্ষেত্রে অলোকরঞ্জনের নিজস্ব পাঠটিই তাঁর অনুবাদে প্রতিফলিত। ভাষা ও শব্দ চয়নে রোদ্দুর, সৌর ইত্যাদি শব্দকে নারীবাদীরা পুরুষালি শব্দ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারেন, কারণ মূলে লাইট বা হেভেনলি রয়েছে।

অন্যদিকে ঊর্মিলা চক্রবর্তী একজন নারীর কবিতাকে নারীর কলমে অনুবাদ করেছেন। প্রথমত ডিকিনসনের যতিচিহ্ন ব্যবহারের যে শৈলী তা তিনি নিখুঁতভাবে মেনেছেন, তবে অগ্রাহ্য করেছেন অন্ত্যমিল। তির্যক রোদ্দুর বা সৌর এখানে নেই, আছে আলোর এক বিশেষ বক্রতা এবং স্বর্গীয় আঘাত। এছাড়াও রাজকীয় অসুখ, হতাশার সীলমোহর, মৃত্যুর মুখচ্ছবি ইত্যাদি মূলানুগতভাবেই এনেছেন কবি। ডিকিনসনের যে বিষণ্ণতাবোধ এবং কবিতার অন্তিমে যে অসম্পূর্ণতা ও হতাশার অনুভব পাঠককে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় তাকে ঊর্মিলার অনুবাদ ধরেছে যথাযথভাবে, এক্ষেত্রে অলোকরঞ্জন অনেকখানি স্বানুগত। মূলকে ছুঁয়ে অলোকরঞ্জন চান কবিতার মুক্তি, আর ঊর্মিলা হতে চান মূলের অনুগামী। এই অনুবাদটির ক্ষেত্রে অন্তত নারীবাদী অনুবাদতত্ত্বের আত্মবিলোপের নীতিটি প্রযোজ্য নয়। তাছাড়া অনুবাদতত্ত্বে ভেনুটি কথিত দেশিকরণ ও বিদেশিকরণ নীতি মেনে নিলে, ঊর্মিলা বিদেশি কবিতাকে একই মেজাজে রাখতে চান, অলোকরঞ্জন দেন দেশীয় চরিত্র। তবে উভয় অনুবাদেই বহির্জগৎ থেকে অন্তর্লোকের দিকে কবিতাটির যে অভিযাত্রা, তা ধরা পড়েছে।

এই ২৫৮ সংখ্যক কবিতাটির আরও দুটি অনুবাদ পাওয়া যায় দুই বাঙালি পুরুষের কলমে। একজন দেবতোষ বসু এবং অন্যজন জিললুর রহমান। দেবতোষ পঞ্চাশের কবিদের সমকালীন প্রাবন্ধিক-অনুবাদক। শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে তাঁর বই *এই কাব্য, এই হাতছানি* জনপ্রিয়তা পেয়েছে। অগ্রজ কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তকে উৎসর্গ করা *নিত্য মুহূর্তের দিগন্তে* (১৯৯৫) বইটিতে তিনি 'এমিলি ডিকিনসন ও তাঁর কয়েকটি কবিতা' নামে একটি ছোট্ট গদ্য লিখেছেন, যেখানে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন,'রোমান্টিকদের

উত্তরপুরুষ ডিকিনসনের সঙ্গে এলিয়টের মিল খোঁজা পণ্ডশ্রম মাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু এলিয়টের শিল্পবিবেক এমিলি ডিকিনসনের খুব অনাত্মীয় কি?' লেখার শেষে যুক্ত হয়েছে তাঁর প্রিয় পাঁচটি কবিতার তরজমা, যার অন্যতম 'আলোর একটি'। দেবতোষও দেশিকরণে বিশ্বাসী এবং ডিকিনসনের ড্যাশ বা ক্যাপিটাল লেটার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি। শব্দ চয়নেও প্রচলিত কলাবৃত্ত ছন্দের চলনকে বজায় রেখেছেন। ফলত, ইনি অলোকরঞ্জনের সধর্মী। আবার পেশায় চিকিৎসক-অধ্যাপক চট্টগ্রামের আশির কবি-অনুবাদক জিললুর রহমান ফেব্রুয়ারি ২০১৮ সালে সিলেট থেকে প্রকাশ করেন 'এমিলি ডিকিনসনের কবিতা'। এখানে বিয়াল্লিশটা কবিতার অনুবাদ এবং অনুবাদকের কৈফিয়ৎ ও নাতিদীর্ঘ কবি পরিচিতি রয়েছে। ঊর্মিলা চক্রবর্তীর পূর্ব প্রকাশিত অনুবাদ-গ্রন্থটির মতোই জিললুর রহমান বিশ্বাস করেছেন, অন্ত্যমিলের প্রতি জোর দেওয়াই ডিকিনসন অনুবাদের অন্তরায়। বাংলাদেশেও তিনি সুব্রত গোমেজ সহ আরও অনেকের অনুবাদ পড়েছেন, তবু তাঁর কৈফিয়ৎ :

> ডিকিনসনের যে কাব্যভঙ্গির ছোট ছোট পদ, ড্যাশ-যতিচিহ্ন দিয়ে দিয়ে লেখা ছোট ছোট কথা — অথচ অনেক গভীর অর্থবাচকতা ধরে রাখে — তা যেন আমরা এই অনুবাদগুলোতে সেভাবে পাচ্ছি না। তার যতিচিহ্নগুলো যেন তার হতাশা, আক্ষেপ ও নির্জনতার দীর্ঘশ্বাস হয়ে কবিতায় মূর্ত হয়ে ওঠে। (২০১৮ : ২২)

এই ভাবনা থেকেই তিনি অনুবাদে হাত দেন, সাধর্ম্য খুঁজে পান নির্জনতার কবি জীবনানন্দের সঙ্গেও। সম্প্রতি অনুবাদকের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপে জেনেছি, অনুবাদে বড় হাতের অক্ষরগুলিকে বোল্ড করে দেওয়া হলেও প্রকাশক তা ধরতে পারেননি। তিনিও এই কবিতাটি অনুবাদ করেছেন, নাম দিয়েছেন 'সেথা আছে নিশ্চয় তীক্ষ্ণ আলোকরশ্মি'। এখানে ড্যাশ এবং ছোট ছোট শব্দের ডিকিনসনীয় রীতিকে তিনি ধরে রাখতে পেরেছেন, যদিও অন্ত্যমিল বর্জিত স্বভাবতই।

দুটি অনুবাদ পাশাপাশি রাখা হলো :

দেবতোষ বসু	**জিললুর রহমান**
আলোর একটি হেলানো ধরণ আছে শীতের বিকেল জুড়ে বুকে চেপে বসে, যেমন পাষাণ ভার গীর্জার স্থায়ী সুরে। ঐশী আঘাত দেয় আমাদের এমন খুঁজেও মেলে না চিহ্ন আসলে তফাৎ ভিতরে, যেখানে সকল প্রকরণ নিষ্পন্ন। পারে না শেখাতে কেউ তাকে কিছু, সে যে হতাশা, অপহ্নব; রাজকীয় জ্বালা যন্ত্রণা তার, যেন মহাশূন্যোদ্ভব।	সেথা আছে নিশ্চয় তীক্ষ্ণ আলোকরশ্মি শীতের শুকনো ম্লান বিকেলগুলো – দমিয়ে দেয় যেন উচ্চকিত বড় গির্জার সুর – কোনো খুঁত আমরা পাই না কোথাও, তবে ভেতরের তারতম্য, আমাদের দেয় স্বর্গীয় যন্ত্রণা – সেখানেই তাৎপর্য – এ এক রাজকীয় হতাশার ছাপ – শেখাতে পারে না কেউ – কিছুই – আমাদের বাতাস প্রেরিত এক সাম্রাজ্যিক জরা –

সে যখন আসে, নিসর্গ কান পাতে ছায়া চাপে নিঃশ্বাস, সে যখন যায়, সেই দূরত্বে ফোটে মৃত্যুর দূরাভাস।	যখন তা আসে, চরাচর শোনে – ছায়ার তখন – শ্বাস ধরে রাখে – যখন তা যায়, দূরত্বের বেশে মৃত্যুর ভঙ্গিতে –

কেবল তির্যক রোদ্দুর বা বাঁকা আলোর বদলে জিললুর নিয়েছেন 'তীক্ষ্ণ আলোকরশ্মি', বাকি অংশে মূলানুগত এবং ডিকিনসনের প্রাকরণিক বৈশিষ্ট্যকে ধরে রাখার আন্তরিক চেষ্টা করেছেন জিললুর। অলোকরঞ্জন ও দেবতোষের অনুসৃজনের পাশে ঊর্মিলা ও জিললুরের অনুবাদ দুটিকে তুলনামূলক ভাবে পড়লে কে, কতখানি ডিকিনসনের কাছাকাছি, তা বুঝে নেওয়া সহজ হয়। তবে ডিকিনসনের অনুবাদ-চর্চায় এই দুই ধারার অনুবাদের কোনোটির গুরুত্বই কম নয়, মনে করি।

তারপর রুদ্ধ করে দ্বার

ডিকিনসনের সব থেকে উচ্চারিত কবিতা 'The Soul selects her own Society' (Fr 303)। এ-কবিতাকে কবির সিগনেচার-কবিতাও বলা চলে। প্রথম ছত্রেই লিঙ্গ-চিহ্নিত (her) করে দেন কবি তাঁর সত্তাকে। ব্যক্তিজীবনেও এমিলি এমনই নির্জনতাপ্রিয় এবং বন্ধু-নির্বাচনে সতর্ক ছিলেন। এই ছোট্ট কবিতাটির দিকে এবার তাকানো যাক, যার তিন অনুবাদক : দেবতোষ বসু, ঊর্মিলা চক্রবর্তী, জিললুর রহমান :

মূল কবিতা	**দেবতোষ বসুর অনুবাদ ('আত্মা বেছে নেয় তার পথ')**	**ঊর্মিলা চক্রবর্তীর অনুবাদ**
The Soul selects her own Society– Then – shuts the Door – To her divine Majority – Present no more –	আত্মা বেছে নেয় তার পথ তারপর রুদ্ধ করে দ্বার। তার সেই স্বর্গীয় স্বমত কখনো কোরো না অস্বীকার।	*আত্মা* বেছে নেয় তার আপন সঙ্গী – তারপর – রুদ্ধ করে *দ্বার* – তার ঐশ্বরিক *সম্পূর্ণতায়* – পেশ করে না আর কাউকে –
Unmoved – she notes the Chariots – pausing – At her low Gate – Unmoved – an Emperor be kneeling Upon her Mat –	নির্বাক সে শোনে মৃদু শকটের যতি তার ক্ষুদ্র সদর দরজায়। নিশ্চল সে সম্রাটের অষ্টাঙ্গে প্রণতি দেখে তার ভূমিষ্ঠ কাঁথায়।	অবিচলিত – সে লক্ষ্য করে যে *রথগুলি* থামে তার নীচু *দরজায়* – অবিচলিত – যদি কোনো *সম্রাট* হাঁটু গেড়ে বসে তার *মাদুরে* –
I've known her – from an ample nation – Choose One – Then – close the Valves of her attention – Like Stone –	আমি যে দেখেছি তাকে বহুর সমাজে নাও বেছে এক। তারপর দেয়ালেতে যত দৃষ্টিপথ খোলা আছে সমস্ত মিলাক।	আমি তাকে দেখেছি – এক বিশাল জাতি থেকে বেছে নিতে *একজনকে* – তারপর – তার মনোনিবেশের *কপাটগুলো* বন্ধ করতে *পাথরের* মতো।

এ-কবিতার চিত্রকল্পগুলি যেন এক নির্জন আত্মার দরজা বন্ধ করার উৎসব — সেখানে রথ, দরজা, সম্রাট এবং অবিচলিত মনোনিবেশের কপাট এসব মিলেমিশে সত্তার কঠোর-কঠিন নির্বাচনের স্বাধীনতাকে ইঙ্গিত করে। দু'টি অনুবাদই মূলানুগত, যদিও দেবতোষ বঙ্গীকরণ বা দেশিকরণ করেছেন কিন্তু ঊর্মিলা মূলের বেশি কাছাকাছি। কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টা স্পষ্ট হবে। যেমন, Chariots = মৃদু শকটের যতি / রথগুলি; Upon her Mat = ভূমিষ্ঠ কাঁথায় / তার মাদুরে; Valves of her attention = যত দৃষ্টিপথ খোলা আছে / মনোনিবেশের কপাটগুলো ইত্যাদি। ঊর্মিলা চক্রবর্তী বিদেশিকরণ-এর আদর্শে বিশ্বাস রেখে মূলের প্রতিশব্দ মাদুর বা রথ-কে অনুবাদে হুবহু এক রেখেছেন। এমনকি ডিকিনসনের ভাষার আপাত নিরাবেগ ভঙ্গি, প্রচুর ড্যাশের ব্যবহার এবং বড় হাতের অক্ষরকে বাঁকা হরফে অনুবাদের সাহস দেখিয়েছেন। সেদিক থেকে দেবতোষ মিলের ব্যাপারে ডিকিনসনের অনুসারী হলেও অনুবাদকের মুক্তির পক্ষে, অন্যদিকে ঊর্মিলা মিল বাদ দিয়ে বাকি সব ক্ষেত্রেই অতি বিশ্বস্ত। কবির সঙ্গী নির্বাচনের এই দৃঢ় মনোভঙ্গি তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক, সেখানে ক্ষমতা-প্রতিপত্তি-অর্থ নয়, হৃদয়ের কাছাকাছি যে সে-ই মূল্য পায় তাঁর নারীসত্তার কাছে। প্রসঙ্গত তৃতীয় তরজমাটি শেষে উদ্ধার করা যায়, কিছু শব্দের বদল ছাড়া এটি ঊর্মিলা দেবীর মতোই মূলের কাছাকাছি :

আত্মা তার নিজের সমাজ বেছে নেয় —
তারপর — দুয়ার সেঁটে দেয় —
তার স্বর্গীয় সমারোহে —
দৃশ্যমান সে নয় আর

অনড় — রথের বিরাম গণনায় মগ্ন —
বিনত ফটকে তার —
স্থবির — সম্রাট এক নতজানু —
তার মাদুরের উপর —

আমি তাকে জেনেছি — এক সুমহান জাতির নিকট —
একটি বেছে নাও —
তারপর — পাথরের মতো —
তার আগ্রহের কপাটগুলো বন্ধ করে দাও — (জিললুর রহমান অনূদিত)

এক গুলিভর্তি বন্দুক

আমেরিকার গৃহযুদ্ধের (১৮৬১-৬৫) অভিঘাত ডিকিনসনের কবিতায় ছায়া ফেলেছে। তাঁর 'My life has stood – a Loaded Gun' (Fr 764) — তাঁর এই বিখ্যাত কবিতাটিতে অনেকে যুদ্ধের ছায়া দেখেছেন। কবিতাটি অনেকার্থদ্যোতক বলা চলে। বন্দুক এখানে জীবনের সঙ্গে তুলনায় এসেছে, সে জীবন এক নারীর ও তার হাতে কলমের শক্তিকেও ইঙ্গিত করে। বন্দুক সাধারণভাবে পুরুষালি প্রতিমা নির্মাণ করে, যা হত্যায় সক্ষম কিন্তু নিজে অমর। ফলত, এই কবির কবিতাই যেন গুলিভর্তি বন্দুক, যা আঘাতে সক্ষম ও শাশ্বত সেই উচ্চারণ। এ-কবিতার তিনটি অনুবাদের কিছুটা উদ্ধার করে আর কিছুটা

ব্যাখ্যা করে আমরা কবিতাটির অর্থ বুঝে নিতে পারি :

মূল কবিতার শেষ স্তবক	Though I than He – may longer live He longer must – than I For I have but the power to kill– Without – the power to die.
ঊর্মিলা চক্রবর্তী	আমি *তার* চেয়ে – বেশিদিন বাঁচতে পারি তাকে বেশিদিন থাকতে হবে – আমার চেয়ে – কারণ আমার কেবল মারবার ক্ষমতাই আছে, ক্ষমতা নেই – মরবার –
জিললুর রহমান	যদিও তাঁর চেয়ে আমি – দীর্ঘকাল বাঁচতে পারি – তাকে অবশ্যই বাঁচতে হবে – আমার অপেক্ষা বেশি – কেননা আমার শক্তি আছে কাউকে মারার, মরার ক্ষমতাহীন –
তরুণ মুখোপাধ্যায়	যদিও তার চেয়ে আমি দীর্ঘজীবী হতে পারি তবুও দীর্ঘায়ু হওয়া তার বেশি দরকার, কেননা আমি তো জানি শুধু মারবার কৌশল কীভাবে মরতে হয় শিখিনি শিল্প তার।

এ-কবিতার অনুবাদে স্বভাবতই নিজস্বতা দেখিয়েছেন তিন অনুবাদক, যা অবশ্যই তাঁদের ব্যাখ্যার স্বাধীনতা এবং শৈলীগত স্বাতন্ত্র্যের কারণে।

প্রথমত, 'loaded gun' = গুলিভর্তি বা গুলিভরা বন্দুক এই শব্দবন্ধ কারো অনুবাদেই ইতরবিশেষ হয়নি। তবে 'Sovereign Woods' = রাজকীয় বনে (ঊর্মিলা), সমৃদ্ধ অরণ্যে (তরুণ), সার্বভৌম বনেজঙ্গলে (জিললুর রহমান) ভিন্নার্থ প্রকাশ করেছে, জিললুরের তুলনায় বাকি দু'টি অনুবাদ বেশি মানানসই মনে হয়। তবে সার্বভৌম শব্দের মধ্যে যে গণতান্ত্রিক অধিকারের ইঙ্গিত আছে, সেটি উপেক্ষার নয়।

দ্বিতীয়ত, তৃতীয় স্তবকে 'And do I smile, such cordial light' = আর আমি হাসলে এমন উষ্ণ আলো (ঊর্মিলা), এবং আমি যেই হাসি সহৃদয় আলো (তরুণ), আর আমি হাসি, তেমন আন্তরিক আলোকময় (জিললুর) — ভাষান্তরে প্রত্যেকের স্বরায়ণ আলাদা। হাসির দীপ্তিকে আলোর সঙ্গে তুলনা করেছেন কবি, তবে কর্ডিয়াল-কে তিনটে ভিন্ন তৎসম শব্দে ব্যাখ্যা করেছেন অনুবাদকেরা।

তৃতীয়ত, 'Tis better than the Eider Duck's / Deep Pillow – to have shared' = সেটা অনেক ভালো আইডার-হাঁসের / গভীর বালিশ — দু'জনে ভাগ করে নেবার চেয়ে (ঊর্মিলা), এই ঢের ভালো আইডার হাঁসের পালকের নরম গভীর বালিশ ভাগ না-করা (তরুণ), এতো ঢের ভালো পালক-আবৃত / গভীর বালিশের চেয়ে —

অংশীদারিত্বের জন্যে — (জিললুর) : এই তিন অনুবাদে 'পালক' যুক্ত করেছেন দুই অনুবাদক, যা বালিশের আরামকে বুঝিয়ে দেয়, যদিও মূলে 'ফেদার' শব্দ নেই। তবে জিললুর 'আইডার হাঁস'-কে কেন বাদ দিয়েছেন, বোঝা গেল না।

চতুর্থত, শেষ ছত্রে এসে 'power to die'-এর অনুবাদে ঊর্মিলা বা জিললুরের তরজমায় 'ক্ষমতা নেই — মরবার' কিংবা 'মরার ক্ষমতাহীন —' অপেক্ষা 'কীভাবে মরতে হয় শিখিনি শিল্প তার' বেশি কাব্যিক, তবে মূলানুগ নয়।

কবিতাটির ত্রিবিধ অনুবাদের দর্পণে পাঠ আমাদের এভাবেই সমৃদ্ধ করে।

জীবনই তো মৃত্যুহীন

ঊর্মিলা চক্রবর্তী ছাড়াও কবিতা সিংহ, নবনীতা দেবসেন প্রমুখ মহিলা কবি বিচ্ছিন্ন ভাবে ডিকিনসন অনুবাদ করেছেন নানা সংকলনের জন্য। যেমন, কবিতা সিংহ 'কখনো দেখিনি' শিরোনামে 'I never saw a moor' (Fr800A) কবিতাটি অনুবাদ করেছেন দেশীয় অনুষঙ্গ-সহ :

Source Text	**Target Text**
I never saw a Moor – I never see the Sea – Yet know I how the heather looks and what a wave must be I never spoke with God Nor visited in heaven Yet certain am I of the spot As if the chart were given.	আমার এ জীবনে সাগর দেখিনি তো – কেমন রূপ ধরে শ্যামল জলাভূমি তবুও জানি কাঁপে কী করে উলুবন – সাগরে ঢেউ তোলে কী ছাঁদে মৌসুমী। হৃদয়ে বিশ্বাস কোথাও খুঁজে পাব কেমন ঈশ্বর কেমন মুখ তাঁর যদিও স্বর্গের গড়ন জানিনাক চেনা সে দিশা যেন পথের ঠিকানায়।

উলুবন কিংবা মৌসুমী যেমন বাংলায় খুব চেনা শব্দ, যাকে অনুবাদে ব্যবহার করেছেন কবি, যদিও মূলে ঋতু বা বাতাসের কথা নেই। কবিতাটিতে ঈশ্বর ও স্বর্গ না-দেখাকে কবি সাগর ও জলাভূমি না-দেখার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তবুও প্রকৃতির খেলা যেমন তিনি বোঝেন, তেমনই বোঝেন ঈশ্বরের উপস্থিতি। এ-কবিতা তাঁর আস্তিক্যবোধের স্মারক। তবে এ-অনুবাদ মূলত ভাবানুবাদ বলা চলে। এর পাশে নবনীতা দেবসেনের অনুবাদে 'আমি তার সঙ্গে বাস করি' কবিতাটি আমরাও পাই তাঁর *সারা পৃথিবীর কবিতা* (২০২০) সংকলনে, যদিও তিনি কবিতার সংখ্যা হিসেবে ৩৫ লিখেছেন, কিন্তু জনসন সম্পাদিত কবিতাসমগ্রে কবিতাটির সংখ্যার সঙ্গে তা মেলেনি। প্রথম পঙ্‌ক্তি দিয়ে ডিকিনসনকে চিহ্নিত করার দস্তুর আমরা জানি, কিন্তু এখানে নবনীতা তা করেননি বলেই মূল খুঁজে পেতে প্রাথমিকভাবে সমস্যা হয়। তদুপরি কোন সংকলন থেকে তিনি বেছেছেন এ-কবিতা, তারও উল্লেখ নেই। আসলে নবনীতা ৩৫-সংখ্যক বলে উল্লেখ করলেও জনসন সম্পাদিত সংকলনে এ-কবিতা পাওয়া যায় ৪৬৩-সংখ্যক কবিতা হিসেবে, যার প্রথম পঙ্‌ক্তি : 'I live with Him – I see His face'। অন্যান্য কবিতার মতোই এ-কবিতাও কবির আত্মকথন; বিবাহবন্ধন নয়, এক অনামা আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের সঙ্গে যেন তাঁর বাস এবং অমরতার অনুভব কবিতাটিকে বিশেষত্ব দিয়েছে। কবিতাটির শেষ স্তবক এইরকম :

Source Text	Target Text
Taught Me – by Time – the lower Way– Conviction – Every day – That Life like This – is stopless – Be Judgement – what it may –	সময়ের শিক্ষা এই, যে নিম্ন গতিতে, প্রতিদিন নালিশ, প্রতিদিন অপরাধী – এইরকম জীবনই তো মৃত্যুহীন, শেষ বিচার হোক না যেমনই!

'প্রতিদিন নালিশ — প্রতিদিন অপরাধী' — ব্যাখ্যামূলক এবং খুবই সাবলীল লাগে পড়তে। বোঝা যায়, এখানে নবনীতা মূলানুগত হয়েও স্রষ্টা হয়ে উঠেছেন। এছাড়া ডিকিনসনীয় ড্যাশ মাঝেমধ্যে রাখলেও বড় হাতের হরফ বর্জন করেছেন।

শ্রীমতী ডিকিনসনের সমধর্মী

বাংলা অনুবাদে ডিকিনসন-চর্চার পাশাপাশি তাঁকে নিয়ে সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লেখা হয়েছে বেশ কিছু, তাঁদের মধ্যে অগ্রণী প্রাবন্ধিক কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। প্রথম যৌবনের তির্যক রোদ্দুরের ছায়া উত্তরকালেও অলোকরঞ্জনের স্মৃতিকে আচ্ছন্ন করেছে বারবার। রবীন্দ্র-সার্ধশতবর্ষে যখন ইউরোপে রবীন্দ্রনাথকে পুনরাবিষ্কার করার আন্তরিক উদ্যোগ নিয়ে 'সারাদিনমান' ঘুরে চলেছেন অলোকরঞ্জন, ঠিক তখনই ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর উপহার দেওয়া ডিকিনসনের শীর্ণ বইটি তাঁকে আবার ডিকিনসনগ্রস্ত করে তুললো। এ-বই তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী। তাঁর মনে হলো,

> জীবদ্দশায় এই কবির রচনা গ্রন্থাকারে বোঝায়নি, তথ্য হিসেবে কথাটা গ্রাহ্য হলেও 'কড়ি ও কোমল'-এর কবির নির্মীয়মাণ চৈতন্যে যে তিনি আদৌ আলোড়িত হননি, এরকম প্রাঙ্‌নির্ণয় সংগত নয়।
>
> (দু'রকম রোদ্দুর, রবীন্দ্র-আলোকবর্ষে, ২০১২ : ১৬৫)

রবীন্দ্রসাহিত্যে হুইটম্যানের ছায়া এবং কবির স্বকৃত অনুবাদের কথা আমাদের জানা। কিন্তু তাঁর লেখালেখির মধ্যে কোথাও ডিকিনসনের কথা আমরা পাইনি কখনো। তবু অলোকরঞ্জনের এই অনুমান আমাদের ভাবিত করে। যদিও 'কড়ি ও কোমল' পর্বে ডিকিনসন কীভাবে ছায়া ফেলতে পারেন তার কোনো উল্লেখ নেই এই নিবন্ধে। বরং যৌবনে করা 'তির্যক রোদ্দুর' অনুবাদটি নতুন বিন্যাসে ও শব্দযোজনায় এখানে স্মৃতিজীবিত হতে দেখি :

> তির্যক এক রোদ্দুর এসে পড়ে
> শীতের শেষ দুপুরে,
> পীড়া দেয়, যেন বিরুদ্ধ স্বরলিপি
> ক্যাথিড্রালের সুরে।

এই উচ্চারণের সঙ্গে তিনি 'সানাই' কাব্যের 'শীতের বেলায় রৌদ্র তোমার জানালায় পড়ে বেঁকে'-র দূরান্বয় পান। যদিও রবীন্দ্রজিজ্ঞাসুরা শীতের দেশের রোদ্দুরের সঙ্গে বাংলাদেশের সোনালি শীতে 'আকাশের অপূর্ব আবিলতা'র মিল খোঁজা নিয়ে প্রশ্নাতুর হতেই পারেন, এমন সংশয় ব্যক্ত করেছেন

তিনি। এই দুই কবির দেশ-কাল আলাদা হলেও রবীন্দ্রকবিতার দেশকালাতীত আবেদন এখানে তাঁকে আশ্বস্ত করে। 'অস্তিত্বব্যাপী কান্না পাওয়ার অকূল আয়োজন'-এ তাঁর কাছে ডিকিনসন ও রবীন্দ্রনাথ পাশাপাশি এসে বসেন। তাই মনের মধ্যে জেগে ওঠে আরো চার ছত্র :

কেন মনে হয়, যেন দূর ইতিহাসে
কোনো বিদেশের কবি
বিদেশী ভাষার ছন্দে দিয়েছে এঁকে
এ বাতায়নের ছবি।   (জানালায়, সানাই)

ডিকিনসনের উত্তরজাতক রবীন্দ্রনাথের কবিতায় রৌদ্রের অনুষঙ্গ তাই ডিকিনসনের সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয় তাঁর। হ্যানোভারের বক্তৃতা শেষে এক ডিকিনসন-গবেষক তরুণের প্রশ্নের উত্তরে রৌদ্রের কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি ডিকিনসনের রৌদ্রচেতনাকে মেলাতে চান। তুলনাটি এইরকম :

সে যখন আসে, নিসর্গ সব শোনে,
ছায়ারা সবাই নিঃশ্বাস দেয় মেলে,
সে যখন যায়, গড়ে ওঠে ব্যবধান
মৃত্যু সামনে এলে।   (ডিকিনসন, তরজমা : অলোকরঞ্জন)

মাঘের তরুণ রৌদ্র ধরণীর 'পরে
বিছাইল দিকে দিকে স্বচ্ছ আলোকের উত্তরীয়।
এ কথা রাখিনু লিখে
উদাসীন চিত্রকার এই ছবি মুছিবার আগে।   (আরোগ্য : ৬)

অলোকরঞ্জনের মতে 'এই রোদ্দুরও শ্রীমতী ডিকিনসনের সমধর্মী। সে যতক্ষণ থাকে, ধরিত্রী আমাদের চোখে বেঁচে থাকে, আর তারপর নেমে আসে মৃত্যুর বিভীষিকা'। একালের সমালোচক হয়তো প্রশ্ন তুলবেন, ডিকিনসন ঠিক রোদ্দুরের কথা বলেননি, বলেছেন সূর্য ডোবা শীতের বিকেলে চাপা আর বাঁকা আলোকরেখার কথা। ফলত তির্যক রোদ্দুরের সূত্র ধরে রবীন্দ্রসাহিত্যে রোদের অনুসঙ্গ খোঁজার প্রয়াস এবং মৃত্যুচেতনার কথাও অযৌক্তিক হয়ে পড়ে না কি? তবু আলোর অধিক যে-অন্ধকার রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কবিতা ও ছবিতে ধরা পড়েছিলো, তার প্রেক্ষিতে ডিকিনসনের কবিতাংশ কেন জানি খুব অপ্রাসঙ্গিক মনে হয় না আমার। মানবাত্মার অনপনেয় অসুখকে দুই কবি নিজের মতো করে দেখেছেন। ডিকিনসন যখন প্রকৃতির বহিরঙ্গ বর্ণনা থেকে ক্রমশ অন্তর্লোকের 'রাজকীয় অসুখ' কিংবা 'হতাশার সীলমোহর'-এ এসে মেলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ অন্ধকারের উৎস থেকে আলোকেই দেখাতে চান। আর মৃত্যুঞ্জয়ী চেতনার জয়গান ডিকিনসনে পাই "Dissolve" says Death. The Spirit, "Sir, / I have another trust", কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'আমি মৃত্যু-চেয়ে বড়ো এই শেষ কথা বলে / যাব আমি চলে।' (মৃত্যুঞ্জয়, পরিশেষ)। প্রসঙ্গত মনে পড়ে, তাঁর নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির জীবনানন্দ স্মারক বক্তৃতার যে অনুলিখন আমি করেছিলাম মোবাইল রেকর্ডার থেকে, তার শিরোনামটি ডিকিনসন থেকেই নেওয়া 'সত্তা বেছে নেয় তার নিজস্ব সমাজ'। সেখানে নির্জনতা প্রিয় কবি ডিকিনসনের সঙ্গে

জীবনানন্দের তুলনা প্রসঙ্গে অলোকরঞ্জন জানান :

> কিন্তু একটা কথা আমি বলতে চাইছি যে, নির্জনতম কবি এই অভিধাটা ভুল। এক হিসেবে প্রত্যেক কবিই যখন লিখতে বসেন নির্জনতম। তখন যদি একটি মন্দিরা বাজিয়ে একটি ভিখিরি বাউল চলে যায়, তার যে দয়া, তার যে করুণা তার এই নিঃসঙ্গতায় শুশ্রূষার মতো কাজে লাগে। তাছাড়া তিনি ভয়ংকর নিঃসঙ্গ। সে তো ঠিকই। কিন্তু কি করে বলি যে তিনি নির্জনতম কবি? আমি সেই কথাটাতেই আসছি। আমি বলতে যাচ্ছি, আমার একটাই বলার ব্যাপার আছে যে, তাঁর সাহিত্যের যাঁরা পূর্বসূরী কয়েকজনকে তিনি নির্বাচন করে তাঁর কবিতার জীবনটাকে চুটিয়ে ভোগ করে গিয়েছেন। (অপ্রকাশিত বক্তৃতা)

ডিকিনসনকে কেন্দ্র করে অলোকরঞ্জন এভাবেই তাঁর ভাবনাবীজকে আমাদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন দেখা যায়। বাঙালির ডিকিনসন-চর্চার অলোকরঞ্জনের ভূমিকা ছোট হলেও ভাবনাজাগর।

কবিতা জীবনের-ই অনুবাদ

দেবতোষ বসু তাঁর *নিত্য মুহূর্তের দিগন্তে* (১৯৯৫) বইয়ে 'এমিলি ডিকিনসন ও তাঁর কয়েকটি কবিতা' শীর্ষক নিবন্ধে আড়াই পাতার কবি পরিচিতিসহ পাঁচটি কবিতা অনুবাদ করেছেন দেখি। সেখানে ডিকিনসনের কবিধর্ম নিয়ে যেমন সুচিন্তিত মন্তব্য করেছেন, তেমনই এলিয়টের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য নিয়েও বলেছেন। দুটি অভিমত উদ্ধার করা হলো :

> তাঁর কবিতা যে এক আশ্চর্য ও অস্বাভাবিক মনের ফসল সে কথাও আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে। কবিতার সঙ্গে মনের যোগ কোথাও ঘনিষ্ঠ, কোথাও বা প্রক্ষিপ্ত, কিন্তু এমিলি ডিকিনসনের ক্ষেত্রে জীবন ও কবিতা শুধু পরস্পরের আত্মীয় নয়, একে অপরের অনুবাদও বটে। (বসু, ১৯৯৫ : ১১১)

> তাঁর কবিতা পড়লে মনে হয়, যাকে বলে কবিতার সঙ্গীত, তাতে তাঁর বিধাতাদত্ত কান ছিল। এই সঙ্গীত তিনি আদায় করে নিয়েছিলেন সাধারণ শব্দ থেকেই, বৃহত্তর অর্থে কথ্যভঙ্গি থেকে — যার মধ্যে অনেক পরে এলিয়ট আমাদের জানিয়েছেন, কবিতার সঙ্গীত সুপ্ত থাকে। এলিয়ট নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে একটি ঘটনাও মনে পড়ে যায়। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলোচক ম্যাথীসেন একবার কৌতূহলভরে এলিয়টকে প্রশ্ন করেছিলেন যে তিনি এমিলি ডিকিনসনের কবিতার দ্বারা নিজেকে প্রভাবিত বলে মনে করেন কিনা। উত্তরে এলিয়ট তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে জানিয়েছিলেন যে ঐ কবির কোনো কবিতা তখনো পর্যন্ত তাঁর পড়া হয়নি। রোমান্টিকদের উত্তরপুরুষ ডিকিনসনের সঙ্গে এলিয়টের মিল খোঁজা পণ্ডশ্রম মাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু এলিয়টের শিল্পবিবেক এমিলি ডিকিনসনের খুব অনাত্মীয় কি? (বসু, ১৯৯৫ : ১১২)

এই ভাবনার সঙ্গে মিল রেখেই তিনি যে-পাঁচটি কবিতার তরজমা করেছেন, তার প্রথম পঙ্‌ক্তিগুলি হলো : সত্য বল, একটি মাত্র বিদেহীকে আমি দেখেছি, মনে হ'ল, আলোর একটি, টের পেলুম জ্বলে উঠলো। এ-কবিতাগুলির কবির প্রতিনিধিস্থানীয় কবিতা এমন নয়, তবে দেবতোষ যে মনোধর্মের পরিচয় এখানে

দেন, তার সধর্মী এই কবিতাগুচ্ছ।

ঊর্মিলা চক্রবর্তী অনুবাদ-গ্রন্থের বিস্তৃত ভূমিকায় ডিকিনসন-কেন্দ্রিক প্রবন্ধ-ই লিখেছেন বলা চলে। বাঙালির কাছে এই স্বল্প পরিচিত কবিকে তিনি এনে হাজির করেছেন এই আলোচনায়। কবির জীবনের পাশপাশি তাঁর কবিতার স্বলক্ষণ ও ব্যঞ্জনা তিনি দৃষ্টান্ত-সহকারে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। আলোচনায় ব্যবহৃত কবিতার অনুবাদগুলি ঊর্মিলাদেবীর স্বকৃত। এখানে যেমন কবির নির্জনতাপ্রীতি, জীবৎকালে খ্যাতি না পেলেও মৃত্যুর পর পৃথিবীর অন্যতম সেরা কবি হিসেবে স্বীকৃতিলাভের প্রসঙ্গ টেনে তাঁর মন্তব্য : 'তাঁর কবিতাকেই বোধ হয় আমরা প্রথম নারীবাদী কবিতা বলে মানতে পারি।' (চক্রবর্তী, ২০১৮ : ২৯) এছাড়া তাঁর কবিতায় মেটাফিজিক্যাল কবিদের প্রভাব, কিট্‌সের প্রেরণা, লিঙ্গবাদী অনুশাসনের চাপ — এসব মিলিয়ে তাঁর জীবন ও কবিতা একই জিনিসের দু'রকম উৎসারণ হয়ে উঠেছিল। চিরকুমারী এই কবির প্রেমচেতনার তীব্রতা আমাদের অবাক করে, প্রকৃতি-ঈশ্বর-মৃত্যু-প্রেম নিয়ে তাঁর কবিতা সহৃদয় পাঠকের মুখাপেক্ষী। ঊর্মিলা দেবী তাঁর ইংরেজি প্রবন্ধ-গ্রন্থ *A Glance Aslant* (২০২১)-এ ডিকিনসনের প্রকৃতিকেন্দ্রিক কবিতার নারীবাদ পাঠ প্রস্তুত করেছেন 'Inebriate of Air : A Feminist Reading of Emily Dickinson's Nature Poetry' প্রবন্ধে । চিরকুমারী এই কবির সামাজিকভাবে অবরুদ্ধ যৌনচেতনা ও আবেগ কীভাবে প্রকৃতির কবিতায় মুক্তি খুঁজেছে তা ঊর্মিলা এখানে দেখিয়েছেন উদাহরণ দিয়ে। তাঁর আলোচনার কেন্দ্রে এসেছে 'A Bird Came Down Walk' (No.328), 'The Grass so little has to do' (No. 333), 'There's a certain slant of light' (No. 253), 'A Narrow fellow in the Grass' (SNo. 986), 'In Winter in my room' (No. 1670) ইত্যাদি কবিতা। পোলক, গ্রিন, লংসোয়ার্থ প্রমুখ সমালোচকদের রেফারেন্স টেনে ঊর্মিলার সিদ্ধান্ত :

> In life her revolt against the imposed order of society was never a positive gesture, but a negative one of renunciation. The one positive gesture of rebellion seems to have been her poetry, and especially her nature poetry. It is here, and here only, that she unleashes all the natural exuberance of her spirit, and is totally, and unashamedly, herself. (2021 : 24)

তৎকালীন আমেরিকার রক্ষণশীল সমাজের নিয়ম তিনি মেনেছেন বহিরঙ্গে, স্ত্রী বা মেয়ে হওয়া তাঁর হয়ে ওঠেনি। কবিতায় তিনি খুঁজেছেন তাঁর উজ্জ্বল উদ্ধার। ঘাস, পাখি, রাত্রি, বজ্রপাত, পোকা ইত্যাদি নিসর্গের নানা অনুষঙ্গে তিনি তাঁর যৌনতার স্বর প্রচ্ছন্ন রেখেছিলেন, যা আজ আমরা অনুভব করি। প্রসঙ্গত তাঁর অনূদিত কবির 'বন্যরাত্রিগুলি হত / আমাদের বিলাস!' (Wild Nights, ২৪৯ সংখ্যক) — আমাদের মনে পড়বে, সেখানে রাতের সমুদ্রের মধ্যে নোঙর করতে চাওয়া আর বন্য রাত্রিবিলাস যে কবির যৌন উচ্ছ্বাসের সুতীব্র প্রকাশ, সহজেই বোঝা যায়।

নিভৃতবাসিনী বীণাপাণি

ডিকিনসন নিয়ে সাম্প্রতিকতম চিন্তাসূত্রটি পাই তরুণ মুখোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধে, শিরোনাম 'এমিলি ডিকিনসন ও জীবনানন্দ : ভাবসামীপ্যে' (তথ্যসূত্র, অক্টোবর ২০১৯। তবে লেখাটি পরে গ্রন্থভুক্ত হয়েছে)। ডিকিনসন ও জীবনানন্দের সাদৃশ্য অলোকরঞ্জন কিংবা জিললুর রহমানের লেখায় উল্লিখিত হলেও সদৃষ্টান্ত ব্যাখ্যা করেননি কেউই। তরুণ মুখোপাধ্যায় লক্ষ করেছেন দুজনেই জন্মসূত্রে উনিশ

শতককে ছুঁয়ে আছেন, একজন উনিশ শতকেরই কবি, অন্যজনের জন্মসাল উনিশ শতকের অন্ত্যলগ্নে। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ও অধ্যাপক জীবনানন্দ ডিকিনসন পড়েননি, এমন ঘটনা অসম্ভব প্রায়। ফলে উভয়ের কবিতার আঙ্গিকগত মিলের পাশাপাশি প্রেম-প্রকৃতি-ঈশ্বর-মৃত্যুচিন্তা-বিষণ্ণতাবোধের তুলনা চলতেই পারে। তাছাড়া জীবনানন্দের কবিতায় উপনিষদীয় প্রেরণা থাকলেও পশ্চিমী আধুনিকতার অভিঘাত সর্বাধিক। কিছু নতুন কথা প্রাবন্ধিক বলেছেন, যা সূত্রাকারে জানানো যেতে পারে :

ক. দুই কবিই মানুষের গুরুত্ব ঈশ্বরের চেয়ে বেশি বলে ভেবেছেন। জীবনানন্দ তাঁর 'সুদর্শনা' কবিতায় লেখেন 'মানুষ কাউকে চায় তার সেই নিহত উজ্জ্বল / ঈশ্বরের পরিবর্তে অন্য কোনো সাধনার ফল'; অন্যদিকে এমিলি লিখেছেন : 'Some Keep the Sabbath going to church – / I keep it, staying at Home –'। কিংবা 'The Bible is an antique Volume – / Written by faded Men'। যদিও ঈশ্বরবাদী নন, তবু উভয়েই আস্তিক্যবাদী। তাই জীবনানন্দ অস্তসূর্যের জয় ঘোষণা করতে পারেন, এমিলিও সব কিছু শেষ হয়ে যায়, ভাবেন না ('The World is not conclusion')।

খ. মানুষ মরণশীল। তাই মৃত্যুভাবনা যে-কোনো কবির কবিতায় অনিবার্য শর্তের মতো থেকে যায়। জীবনানন্দ ভাবেন 'একদিন মৃত্যু এসে যদি দূর নক্ষত্রের তলে / অচেনা ঘাসের বুকে আমারে ঘুমায়ে যেতে বলে'। তিনি গভীর অন্ধকারে ঘুমের আস্বাদে লালিত হতে চান; যদিও সূর্যে সূর্যে চলার প্রত্যয় কিংবা নব নদী, নব নীড়ের জন্য প্রত্যয়ও তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে ডিকিনসন জীবনকে গুলিভর্তি বন্দুক ভাবেন, লেখেন 'Because I could not stop for Death – / He kindly stopped for me –' কিংবা 'I heard a fly buzz – when I died –'। প্রকৃতি-প্রেম-মৃত্যু তাঁদের কবিতায় একসূত্রে গাঁথা হয়েছে প্রায়শ।

গ. বড় হাতের হরফ কবিতার মাঝে সর্বদাই ব্যবহার করতেন ডিকিনসন ঐ শব্দের তাৎপর্য আলাদাভাবে বোঝাতে। বাংলায় এ-সুবিধে নেই (তাঁর অনুবাদে যে-কারণে ঊর্মিলা চক্রবর্তী বাঁকা অক্ষর ব্যবহার করেন) বলে জীবনানন্দ গুরুত্বময় শব্দের পুনরাবৃত্তির পথ বেছেছেন ভাবা যায়। এছাড়া ড্যাশের আধিক্য, তারবার্তার মতো অসম্পূর্ণ বাক্য দিয়ে কবিতা লেখার যে ডিকিনসনীয় চারিত্র্য তা জীবনানন্দকে প্রভাবিত করছে এমন ভাবলে খুব অসঙ্গত হবে না। দুই কবির ক্ষেত্রেই এই ড্যাশ গভীর অর্থময় তথা ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে। যেমন—

ডিকিনসন : 'How dreary – to be – Somebody! / How public – like a Frog –' (Fr303)

জীবনানন্দ : তবু এই ভালোবাসা — ধুলো আর কাদা — / মাথার ভিতরে / স্বপ্ন নয় — প্রেম নয় — কোনো এক বোধ কাজ করে (বোধ)

যৌগিক ও মিশ্রবাক্যের ব্যবহার এবং তাদের সমন্বয় ঘটিয়েছে এই ড্যাশ চিহ্ন, অকথিত কথা ও ব্যথাকে ব্যঞ্জিত করে এই প্রকাশরীতি। একে বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় 'একটি মধুর অবসাদের ক্লান্তি' (কালের পুতুল) বলা চলে।

ঘ. সার্থক চিত্রকল্প বা ইমেজ নির্মাণ আধুনিক কালের কবিতার প্রধান কৃতিত্ব। আবেগসংরক্ত শব্দচিত্রকে চমকপ্রদ ইমেজে উত্তীর্ণ করায় দু'জনেই ক্লান্তিহীন। ডিকিনসন রচনা করতে পারেন : My Life had stood – a Loaded Gun –, She dealt her pretty words like Blades, Death is like the insect / Menacing the tree, Fame is a bee / It has a song, I felt a Funeral, in my Brain — এইরকম অপ্রত্যাশিত চিত্রকল্পমালা। 'উপমাই কবিত্ব'-এই প্রত্যয়জীবী আমাদের জীবনানন্দের উপমাগুলি চিত্রকল্পে উত্তীর্ণ হয় তাঁর চমকপ্রদ অথচ গভীর কল্পনার স্পর্শে : পাখির নীড়ের

মতো চোখ, স্তন তার করুণ শঙ্খের মতো, উটের গ্রীবার মতো নিস্তব্ধতা, হীরের প্রদীপ জ্বেলে শেফালিকা বোস হাসে, বেতের ফলের মতো ম্লান চোখ ইত্যাদি আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। রয়েছে বর্ণপ্রতীক ব্যবহারেও দুই কবির বিশেষ আগ্রহের মিল।

শেষে প্রাবন্ধিক মন্তব্য করেছেন : 'জীবন ও জগৎ ছুঁয়ে-ছেনে যে বিস্ময় ও বেদনা আমরা পাই, তার কাব্যিক ভাষারূপ দিয়েছেন ডিকিনসন ও জীবনানন্দ। এমন সাদৃশ্য, সেও এক বিস্ময় বটে' (২০১৯ : ৩১)

এই প্রবন্ধটি ছাড়াও তরুণ এমিলি ডিকিনসন নিয়ে আরও তিনটি প্রবন্ধ লিখেছেন, কোনোটিতে কবির নির্জন আত্মার পরিচয় দিয়েছেন, আবার কোথাও বা হুইটম্যান ও ডিকিনসনের 'আমি'র সন্ধান করেছেন, এই প্রবন্ধটি সমকালীন দুই কবি সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক পাঠ। এছাড়া এক ফর্মায় ডিকিনসনের ছোট কবিতা অনুবাদগুচ্ছের শেষে তিনি যে পরিচায়িকা লেখেন, সেখানে এমিলির সংস্কৃত সাহিত্যের গুণগ্রাহিতার কথা বলেছেন এবং শকুন্তলার আংটির অনুষঙ্গ তাঁর মনে এনেছে কবির 'I held a Jewel in my fingers / And went to Sleep' কবিতা। উত্তরসাধক কবি সিলভিয়া প্ল্যাথের সঙ্গে এমিলির তুলনামূলক আলোচনাও সংক্ষেপে এখানে করেছেন তিনি। নিভৃতবাসিনী বীণাপাণির মতোই তিনি এই উত্তরসূরীদের প্রেরণা হয়েছেন, এমন অনুমান তাই অসংগত নয়।

আত্মবিযুক্তির লিখনসাধনা

'Writing involves self-alienation' (Newton, 1997 : 47) — বলেছিলেন নিহিতার্থবাদী জার্মান দার্শনিক গাদামার। সমাজ সচেতন কবিরও লিখনসাধনার জন্য এই আত্মবিযুক্তি একান্ত দরকার। চিরকুমারী এমিলি ডিকিনসনের কবিতা সেকালের পুরুষতান্ত্রিক আমেরিকায় আত্মক্ষয়ী নিভৃত সাধনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সমকালে উপেক্ষিত হলেও আজকের পাঠকের দরবারে তাঁর স্বীকৃতি প্রমাণ করে মহৎ কবিতা আসলে কালোত্তীর্ণ হয়। তাঁকে মূলত নির্জনতার কবি হিসেবে দেখা হলেও সমাজ-সমকাল ও নারীচেতনাকে তিনি তাঁর কবিতায় প্রার্থিত মূল্য দিয়েছেন। কিছুটা দেরিতে হলেও বিশ ও একুশ শতক জুড়ে বাঙালির অনুবাদে ও সমালোচনায় তাঁকে পাঠ ও পুনঃপাঠ নির্জন দ্বীপসম এই অনন্যা মনস্বিনীকে আমাদের কাছে আরো গ্রহণীয় করে তুলেছে, সন্দেহ নেই।

ব্যবহৃত গ্রন্থপঞ্জি

ইংরেজি

Emily Dickinson 'The Complete Poems', Edited by Thomas H Johnson, Faber and Faber, London-Boston, Reprint 1986

Emily Dickinson 'Selected Poems', Note by Glennis Byron, York Press-Longman, UK, 2000

Ferdinand De Saussure, Course in General Linguistics (Tr. Wade Baskin), Philosophical Library, New York, 1959

Gayatri Chakrvorty Spivak, Outside in the Teaching Machine, Routledge, New York, 1993

K M Newton Edited. Twentieth-Century Literary Theory, Palgrave, London, 1997

Lawrence Venuti Edited, The Translation Studies Reader, London and New York, Routledge, 2000

Susan Bassnett, Translation, London and New York, Routledge, 2014

Susmita Chakrabarty, Problems of Translation : A Critical Assesment with Particular Reference to Alokeranjan Dasgupta's Translation of Emily Dickinson's Poem 'There's a Certain Slant of Light, International Journal of Humanities and Social Science Studies, Vol III, Issue IV, January 2017 (PDF)

Urmila Chakrabarti, A Glance Aslant : Essays in Womanist Literary Criticism, Avenel Press, Kolkata, 2021

Wendy Martin, The Cambridge Introduction to Emily Dickinson, Cambridge University Press, UK, 2007

বাংলা

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও শঙ্খ ঘোষ সম্পাদিত, সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সং ২০১০

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, রবীন্দ্র আলোকবর্ষে, পত্রলেখা, কলকাতা, প্রথম সং, জানুয়ারি ২০১২

ঊর্মিলা চক্রবর্তী, এমিলি ডিকিনসন : অনন্য জীবন, ভিন্ন উচ্চারণ, এভেনেল প্রেস, মেমারি, জানুয়ারি ২০১৮

ঋতম্ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যের অনুবাদ : বিকীর্ণ ভাবনা, তুহিনা প্রকাশনী, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২৪

জিললুর রহমান অনূদিত, এমিলি ডিকিনসনের কবিতা, চৈতন্য, সিলেট, ফেব্রুয়ারি ২০১৮

তরুণ মুখোপাধ্যায়, এমিলি ডিকিনসন : নিঃসঙ্গ আত্মার কবি, মৃত্তিকা, চুঁচুড়া, জুলাই ২০২২

ঐ, এমিলি ডিকিনসন : কবি ও কবিতা, কথাকৃতি, বেথুয়াডহরি, অগাস্ট ২০২১

দেবতোষ বসু, নিত্য মুহূর্তের দিগন্তে, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, ১৭মার্চ ১৯৯৫

নবনীতা দেবসেন, সারা পৃথিবীর কবিতা, পত্রভারতী, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২০

বিষ্ণু দে, তুমি রবে কি বিদেশিনী (অনুবাদ সংকলন), নাভানা, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৮৬

সুব্রত রায়চৌধুরী সম্পাদিত, তথ্যসূত্র পত্রিকা (অনুরাগী পাঠক ও জীবনানন্দ), ২৪ বর্ষ প্রথম সংখ্যা, কলকাতা, অক্টোবর ২০১৯

সৌরীন্দ্র মিত্র, কবির স্বধর্ম : রবীন্দ্র বিষয়ক প্রবন্ধ, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ২০১২

ওয়েবসাইট

www.edickinson.org // www.poetryfoundation.org // www.poets.org // www.sparknotes.com // springer.com

ঋতম্ মুখোপাধ্যায় : প্রাবন্ধিক, কবি ও প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।